ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- III, January, 2025, Page No. 859- 865
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.077

শ্রী শ্রী সারদা মায়ের ব্যবহারিক বেদান্ত: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

ড.অমিত কুমার বটব্যাল, *রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজের শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ (স্বায়ত্তশাসিত)*

Received: 14.01.2024; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Sri Sarada Devi (1853-1920) is affectionately called "Holy Mother" by millions of people around the world. Sarada Devi was Ramakrishna's wife, spiritual counterpart and spiritual giant in her own right. Holy Mother lived a simple, unassuming and extraordinarily modest life, yet her life and teachings rang with the truth of the highest spiritual realization. As Swami Vivekananda's great disciple Sister Nivedita wrote: "In her one sees realized that wisdom and sweetness to which simplest of women may attain. And yet, to myself the stateliness of her courtesy and her great open mind are almost as wonderful as her sainthood. Her life is one long stillness of prayer." The philosophy of Sri Sarada is the same as that of the Master, Sri Ramakrishna. This is the ancient philosophy of Vedāntic non-dualism. It is a way of life, an ideal belief in the light of which man can always correct his behaviour. It is a religion for the devotee, a philosophy for the intellectual, an ethical code for the atheist. Hence Sri Ramakrishna showed how this philosophy of non-dualism can be the guiding principle of every man's life irrespective of his religion, creed, or country. The purpose of both philosophy and religion is the same, the only difference between them being in their methods of approach. The philosophy of Sri Sarada Devi is a combination of these two approaches and is drastically practical.

Keywords: Vedānta, Religion, Practical, Philosophy, Non-dualism, Ethical, Devotee.

পৃথিবীর ধর্মের ইতিহাসে শ্রীশ্রী মা সারদা দেবী প্রথম নারী যিনি সংঘ জননীরূপে সন্ন্যাসী, গৃহী ভক্তদের দ্বারা পূজিত ও মানিত হয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমার সমগ্র জীবনটি একটি নীরব সঙ্গীতের মত, যা আমাদের আপ্লুত করে, শিক্ষিত করে, বিস্মিত করে না। কারণ তা মানবীর জীবন নয়। আমরা সিদ্ধান্তের উপনীত হই এটিই তাঁর স্বরূপ-ঐরূপ জীবন চর্যা দেবীরই পক্ষে সম্ভব, মানবীর নয়। তাঁর বিশ্ব বন্দিত অবতার বরিষ্ঠ স্বামীর ন্যায় সুবিশাল অমৃত কথা তাঁর নিকট হতে আমরা পাই নি। বলেছেন কমই যা বলেছেন তা কিন্তু স্বর্গের গঙ্গা থেকে নিঃসৃত ধারার মত অমৃতময়ী সুষমামন্ডিত, প্রাণস্পর্শী। তাঁর জীবনে অলৌকিক বা অস্বাভাবিক

ঘটনাকে তিনি প্রাধান্য দেন নি, এমন কোন বাণী দেন নি, যা মানবকে উত্তেজিত করতে পারে, যদিও তাঁর কৃপা স্পর্শে অনেকেই ঈশ্বর দর্শন করেছেন অনেকের পরমপদ লাভ হয়েছে। তিনি যা করেছিলেন তা তাঁর জীবনের মধ্য দিয়েই করেছেন যা ধীরে ধীরে আমাদের অর্ন্তলোককে আলোকিত ক'রে এক অপূর্ব নতুন দিশা দিয়েছে এবং অনুভব করেছি যা নীরবে তিনি করেছিলেন তা এক বিপ্লব। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লব। একে ব্যাখ্যা দেওয়া যায় 'মা'য়ের বেদান্ত চর্চা জীবনে ও ব্যবহারে বলে।

আমরা যারা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ যুগে জন্মগ্রহণ করেছি, শিশুকাল থেকে গৃহে তিনটি আলোক চিত্র দেখে তাঁতে পূজা করে অভ্যস্ত হয়েছি তাঁদের অনেকেরই হয়ত আমার মত ধারণা থাকতে পারে। আমার ধারণা ছিল শ্রীমা সর্বদাই দীর্ঘ, কারণ আর কিছুই নয় ব্রাহ্মণটি ছিলেন এক গ্রাম্য পুরোহিত অথবা কুলগুরু জাতীয় কেউ। তাঁর বাহ্যিক আচার-আচরণে তাঁকে অত্যন্ত সাধারণ কেউ বলে মনে হত। সংসারের সবকিছুরই মধ্যে নিজেকে এমনি ভাবে সম্পূর্ণ আড়লে তিনি ঢেকে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর সহজতার অবগুণ্ঠন তলে বিরাজিত ছিল রাজ-রাজেশ্বরীর মহিমা যা অতিভূত করত হৃদয়কে এবং নত করে দিত অপরকে তাঁর চরণ প্রান্তে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে। তাঁর অন্তরের দৈবী চেতনার আলোককে গোপন করার পক্ষে তাঁর মানবীয় বাহ্যিক আচরণটি ছিল নিতান্তই ক্ষীণ।

শ্রীমা সারদার প্রধান রূপটি হল মাতৃত্বের রূপ। তিনি স্বমুখে বলেছেন, "আমি সকলের মা, সৎ এর মা অসৎ এর মা, পাতানো মা নয় গুরুপত্নী নয়, নিজের মা"[১] । তাঁকে আপন মা বলে বলে বোধ হয় এইজন্য যে তিনি কোন ঐশ্বর্য নিয়ে আসেন নি, যা সাধারণকে দূরে সরিয়ে রাখে। তিনি একখানি আটপৌরে বসন পরে কখনও জয়রামবাটির কুটির থেকে, কখনো-বা বাগবাজারের মায়ের বাড়ি থেকে, কখনও পুরী, কোঠার, বৃন্দাবন, ব্যাঙ্গালোর থেকে ভক্ত সন্তানদের কৃপা করেছেন। তাঁকে আপন মা বলে মনে হয়, কেননা তিনি মাতৃত্ব দিয়ে বিপ্লব এনেছেন। তিনি যে আপন মা বলে মনে হয়, কেননা তিনি মাতৃত্ব দিয়ে বিল্পব এনেছেন। তিনি যে কারণে বর্তমান কালের নারীদের আদর্শ, সেই যথার্থ আধুনিকতা কেও প্রথম বাংলার মাটিতে এনেছেন মাতৃত্ব দিয়েই। তাঁর জীবন চর্যা যা 'জীবনে ও ব্যবহারে বেদান্ত' বলতে চাই, তাও; তাঁর এই সর্বাগ্রাসী মাতৃত্বের জন্যই সম্ভব হয়েছে।

বেদান্তের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্ম সত্য জীব ব্রহ্ম, সর্বভূতে ব্রহ্ম দর্শন করাই বেদান্তের লক্ষ্য। সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন হলে সর্বভূতে প্রেম হয়। এই বেদান্ত এতাবৎকাল গিরি গুহা কন্দরবাসী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের বিষয় ছিল অথবা পন্ডিতকূলের অধ্যয়নের বিষয় ছিল। স্বামীজী এই বনের বেদান্তকে গৃহে আনার ডাক দিয়েছিলেন। তার পূর্বেই শ্রীশ্রীমা তাঁর অননুকরনীয় প্রকারে এর প্রয়োগ করেছিলেন।

তাঁর ভক্তদের স্মৃতিকথা থেকে লক্ষ্য করা যায় যে ভক্তরা তাঁর দর্শন মাত্র তাঁকে মা বলে স্বীকার করে নিতেন। মুহূর্তে তাঁদের সঙ্কোচ-ভয় ভাবনা দূর হত। গৃহীভক্ত, সন্ন্যাসী সন্তানদের স্মৃতিচারণ পাঠ করে একটি চিত্র মানস লোকে ফুটে ওঠে। রাত্রি হয়েছে – জয়রামবাটিতে মাটির দাওয়ায় লন্ঠনের আলোতে মা পদযুগল ছড়িয়ে বসে আছেন, মন কোন্ লোকে – অপেক্ষা করছেন কখন সন্ন্যাসী সন্তান আসবেন, তাঁকে রাত্রির খাবার পরিবেশন করবেন। আবার কখনও ছবি ভেসে ওঠে – রাত্রির অন্ধকারে উঠানের ইটের টুকরোগুলি মা উঠে সন্তর্পণে সরাচ্ছেন, কলকাতার সন্তানগণ যাতে কষ্ট ব্যথা না পান।[২]

মায়ের জীবনচর্যাটি একটু পর্যালোচনা করা যাক। মায়ের গরুকে পরিচারক গোবিন্দ। চর্মরোগ, খোস এ কষ্ট পাচ্ছিল – মা নিজে তাকে দেখিয়ে দিলেন। কীভাবে ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। মায়ের জয়রামবাটি বাসকালের মূর্তি দশভূজা রূপে প্রতিভাত হয়। মা যেন দশ হাত নিয়ে প্রাতঃকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত গ্ররহমার্জনা, কূটনা কোটা, ভক্তদের জন্য গ্রাম হতে তরকারী, সব্জী, দুধ সংগ্রহ, রন্ধন, পরিবেশন, রাত্রির রুটি, ভক্ত অসুস্থ হলে তার পথ্য করছেন। আবার ভক্তের অসুস্থ কন্যার জন্য দুধ সংগ্রহে বেরিয়ে পড়েছেন। গৃহের মধ্যে হয়ত তখন চলছে পাগলী মামীর বিকার, রাধু দিদির অসুখ, মাকু দিদি, নলিনী দিদির অশান্তি, মামাদের বিষয় কলহ, অথচ এরই মধ্যে মা অক্লান্ত ভাবে দীক্ষা দিচ্ছেন গৃহী ও ত্যাগী সন্তানদের। তার কোন সময় অসময় নেই, স্থান, কাল, বিচার নেই – 'মা' বলে এলেই হল। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত পরীক্ষা করে নিতেন আর মা জননী আমাদের জনসাধারণকে গ্রহণ করেছেন নির্বিকারে, নির্বিচারে। কেননা তিনি যে মা, তিনি যে সকলের মা, সকল জীব-জন্তু পশুপক্ষীরও মা। এই মাতৃত্ব তাঁকে যে উদারতার শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল সেটি এই একবিংশ শতকের পৃথিবীর স্পর্শও করতে পারে নি, সেইটি হল মায়ের অপার স্নেহ যা জাতি বর্ণ ধর্ম দোষ গুণ এর সীমা অতিক্রম করে গেছে। আজ একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে ধর্মের নামে হানাহানি অব্যাহত, মৌলবাদ প্রতিটি ধর্মে এখনও বিদ্যমান – আর সেই যুগে আজি হতে শতবর্ষ আগে 'মা' এই গন্ডি ভেঙেছিলেন ছেলে আমজাদের জন্য, শিরোমণিপুরের মুসলিম সন্তানদের জন্য। শিরোমণিপুরের বাসিন্দা রসন আলি খাঁ 'মায়ের কথা'য় বলেছেন যে, "এই শিরোমণিপুর ও পরমানন্দপুরের অনেক পুরুষ ও মহিলার সঙ্গেই শ্রীমার বিশেষ স্নেহের সম্পর্ক ছিল। শিরোমণিপুরের আমজাদ, আমজাদের স্ত্রী মতিজান বিবি ও আমজাদের মা ফতেমা বিবিকে মা খুব স্নেহ করতেন। মা-ই তো প্রায় ওদের সংসার চালিয়ে দিতেন। আমজাদ প্রায়ই গাঁয়ে থাকত না। [আমজাদ মাঝে মধ্যে কারাবাস ও করে আসত – চৌর্য অপবাদে। মা তাও জানতেন, তবু কৃপা] তখন সংসারে অভাব অনটন পড়লে আমজাদের মা ও তার বউ জয়রাম্বাটিতে মায়ের বাড়িতে হাজির হতো। মা ওদের দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। ওদের পেট ভরে গুড় মুড়ি খেতে তো দিতেনই, সেই সঙ্গে মাথার তেল, চাল, কাপড়, জিনিসপত্র অনেক কিছু দিতেন"[৩]।

মা তো আমজাদকে রামকৃষ্ণ – সারদা ভক্তমন্ডলীতে অমর করে দিয়েছেন তাঁর বিখ্যাত উক্তিতে "আমার শরৎ যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে"। মাতা-পুত্রে সুখ দুঃখেরর কথাও হত। আবার পুত্রও লাউ, কলা প্রভৃতি সব্জী নিয়ে মাকে দর্শন করতে এসে প্রসাদ পেয়ে যেত। মা তার উচ্ছিষ্ট স্থান স্বয়ং পরিষ্কার করতেন। আজ এই ঘটনা হয়ত অনেকের আশ্চর্যজনক কিছু নাও মনে হতে পারে কিন্তু আমাদের চিন্তা করতে হবে আজ থেকে দেড়শ বছর – একশ বছর আগের ভারতবর্ষ তথা বাংলার পরিবেশে একজন গ্রামের তথাকথিত অর্থে নিরক্ষর [মা ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য পর্যন্ত পড়েছেন – তারপর আবার হৃদয় বই কেড়ে নিয়েছিলেন] মহিলা, উপরন্তু তৎকালীন গ্রামের কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশ।অবশ্য এজন্য তাঁকে অনেক কষ্ট ভোগও করতে হয়েছিল। একবার ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ ইত্যাদি জাতিগত কোনো কারণে মাকে গ্রামের ক্ষমতাশীল ব্যক্তিরা ২৫ টাকা জরিমানা করেছিল। সে অন্য প্রসঙ্গ, কিন্তু কোন ঘটনাই কোন বাধাই মা-কে তাঁর স্নেহ বিতরণ থেকে বিরত করতে পারে নি। ঐ নম্র করুণাময়ী শান্তমায়ের একটি বজ্র কঠিন ব্যক্তিত্ব এবং ইস্পাত সম দৃঢ় মনের পরিচয় তাঁর জীবন, বাণী, কর্ম ও ধর্মাচরণেই পরিলক্ষিত হয়। রসন আলি খাঁ আরও বলেছেন – "মায়ের নতুন বাড়ি শিরোমণিপুর ও পরমানন্দপুরের মুসলিম মানুষদের সাহায্যে নির্মিত হয়েছিল। তখন জাতপাত নিয়ে খুব সঙ্কীর্ণতা ছিল ঐ অঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যে। মায়ের নতুন বাড়ি হওয়ার সময় মুসলমান মানুষদের কাজে লাগানোর জন্য জয়রামবাটির গোঁড়া বামুনেরা অনেক কথা বলেছিল। ওরা

মা'কে ম্লেচ্ছ বলতেও দ্বিধা করেনি। মায়ের আত্মীয়রাও মাকে বাড়ি তৈরীর কাজে আমাদের লাগাতে নিষেধ করেছিল। মা লোকের সামনে মাথার কাপড় ঢাকা না দিয়ে বেরতেন না। খুবই আস্তে আস্তে কথা বলতেন, কিন্তু যা অন্যায় তার বিরুদ্ধে নির্ভয়ে প্রতিবাদ করতেন। এ ব্যাপারে কোন আপসের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। গ্রামের লোকেদের চাপে দু'একদিন মায়ের ঘরের কাজ বন্ধ ছিল। পরে শুনেছি – মা বলেছিলেন, কেবল আমাদের দিয়েই কাজ করাবেন। শেষ পর্যন্ত মায়ের জেদ ও সঙ্কল্পের কাছে গ্রামের গোঁড়দের নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। তারপর থেকে মায়ের বাড়িতে আমাদের খুব যাতায়াত হতে লাগল। সর্বধর্ম সমন্বয়কারী অবতার স্বামীর শক্তি শ্রীমা সারদা শিরোমণিপুরের পীরের দরগায় ঘোড়া ও সিন্নি মানত করতেন। মা বলেছিলেন, "বাবা ঠাকুর কি আলাদা হয়? সবই এক। তোমরা তো জান বাবা, তোমাদের ঠাকুর ইসলাম ধর্মও সাধনা করেছিলেন। সে সময় নামাজ পড়তেন মুসলমানদের মতোই। সবই এক বাবা। নামেই শুধু ভিন্ন"[৪]।

মা হওয়া নয় মুখের কথা। শ্রীশ্রীমা কথার কথা 'মা' নন সত্যকার মা। তাঁর অপূর্ব আচরণ তাই প্রকাশ করে। বাঁকুড়ার ময়নাপুর গ্রামে থাকতেন শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পুঁথিকার শ্রী অক্ষয় সেন। তিনি একসময়ে অসুস্থ ছিলেন, মাকে নিয়মিত দেখতে **য়াসতে** পারতেন না জয়রামবাটিতে। কিন্তু মাঝে মাঝে মায়ের সেবার জন্য কিছু কিছু পাঠাতেন। একটি নিম্ন শ্রেণীর শ্রমজীবি মহিলার হাতে তিনি মায়ের জন্য কিছু পাঠিয়েছেন। মা তাঁকে সমাদর করে বিশ্রাম ও স্নান আহার করে বাড়ি ফিরে যেতে বললেন। সেই মেয়েটি স্নান করে আহার করে পরম আনন্দিত হল। এদিকে বেলা যায়। মা তখন তাঁকে সেদিন যেতে নিষেধ করে রাত্রে থাকতে বললেন। মেয়েটির শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল মায়ের ঘরের বারান্দায়। মেয়েটি বয়স্কা, তার ওপ ম্যালেরিয়া রোগী। ক্লান্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। মা ভোর রাত্রেই দরজা খুলে দেখেন মেয়েটি অজান্তে বিছানা অপরিষ্কার করে ফেলেছে। মায়ের সঙ্গে যাঁরা থাকতেন তাঁরা ছিলেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও প্রচন্ড রক্ষণশীল। তাঁরা ঘুম থেকে উঠলে বেচারি মেয়েটির দুঃখের অপমানের শেষ থাকবে না মা তাঁকে চুপি চুপি উঠিয়ে, মুড়ি গুড় হাতে দিয়ে রওনা করে দিলেন। এবং তার অপরিষ্কার শয্যা নিজের হাতে পরিষ্কার করলেন[৫]। সর্বভূতে সমদর্শন না হলে এ কি সম্ভব?

মা কোলে টেনে আদর করে নিয়েছিলেন তাঁর আদরের খুকি নিবেদিতাকে। তার সঙ্গে নিয়েছিলেন মিসেস ওলি বুল ও মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডকেও। শ্রীমা ইংরাজী ভাষা, ইংরাজী রীতিনীতি আদব-কায়দায় অনভিজ্ঞা ছিলে। শিক্ষিতা আধুনিকা এ তিন নারীর সঙ্গে তাঁর দুস্তর ব্যবধান। কিন্তু, মহত্ত্ব ও বিশ্বপ্রেম – "সব যে আমার, ছত্রিশ কোথা"। এই ভাবেই কোন বাধাই হয় নি। তিনি তাঁদের আদরেই গ্রহণ করেন। তাঁদের সঙ্গে খাবারও খেলেন। নিবেদিতা এসে প্রথমে মায়ের বাড়িতেই একটি পৃথক ঘরে কিছুকাল ছিলেন (১০/২, বোস পাড়া লেন)। শ্রীমা ঐ বিদেশিনী কন্যাদের কাছ থেকে প্রভু যীশুর উপাসনা কেমনভাবে হয় সেটি জানতেও উৎসুক ছিলেন। নিবেদিতার স্কুলে মা অনেকবার উপস্থিত হয়ে সবার আনন্দ বর্ধন করেছিলেন।বিরটের সঙ্গী ও সাক্ষী হবার যোগ্য মহিমাকে তিনি প্রতি মুহূর্তেই অসেচতনে বহন করতেন। কিন্তু সেই গরিমা সর্বাধিক বাঙ্ময় হয়ে ওঠে যখন তিনি মুহূর্তে মধ্যে কোন নতুন ধর্ম চেতনা বা ভাবের মর্মভেদ অব্যর্থ ভাবে করে ফেলেন[৬]।

মাতা ঠাকুরাণীর এই ক্ষমতার পরিচয় প্রথম ভালভাবে উপলব্ধি করি কিছুদিন আগে। এক ইষ্টার দিবসে যখন তিনি আমাদের আবাসে এসে দর্শন দেন,এই বিশেষ ক্ষেত্রটিকে শ্রীমা ও তাঁর সঙ্গীরা সমস্ত বাড়িটি

ঘুরে দেখার পরে প্রার্থনা কক্ষে বসে খ্রীষ্টীয় ধর্মানুষ্ঠানের তাৎপর্য শুনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন আমাদের ছোট্ট ফরাসী অর্গান যোগে ঈশ্বরের গীতবাদ্য করা হলো। খ্রীষ্টের পিনরুত্থান স্তোত্র শ্রীমার কাছে অপরিচিত ও বিদেশীয় হলেও যে রকম দ্রুত তার মর্মানুভাব করে সুগভীর ভাবাত্মীয়তা প্রকাশ করলেন, তাতেই আমাদের কাছে সর্বপ্রথম অনন্দিত ভাবে উম্মেচিত হলো – সারদা দেবীর বিরাট ধর্ম সংস্কৃতির এক অনন্য দিক"[৭]।

এই মাতৃত্বের আস্বাদ অনুভব করেছিলেন বলেই মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড নিবেদিতাকে শিখিয়েছিলেন শ্রীমাকে 'মা' বলে ডাকতে। মনে রাখতে হবে প্রায় একশ বছর আগেও রক্ষণশীলতা কুসংস্কার তাঁর ছিলনা। একবার নিবেদিতা ভোগ রান্না করে ঠাকুরকে নিবেদন করে তার প্রসাদ শ্রীমাকে খেতে দেন। মা পরমানন্দে তা গ্রহণ করেন। মায়ের সঙ্গে যে সব মহিলারা বাস করতেন তাঁদের মধ্যেও এই বিষয় নিয়ে চাঞ্চল্য প্রকাশ করলে তিনি উত্তর দেন "নিবেদিতা আমার মেয়ে, ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করার অধিকার তার আছে। তার দেওয়া প্রসাদ পরমানন্দে কোন দ্বিধা না রেখে আমি নেব; যদি তাতে কারো আপত্তি থাকে, সে নিজেকে নিয়েই থাক। এই তেজ এই দৃপ্ত ভাব তার জীবনে আবাল্য দেখা যায়। এই মাতৃত্বের দ্বারা সর্বভূতে সমদর্শন এর প্রমাণ শ্রীশ্রী ঠাকুরও পেয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বেরে মা তখন নহবতে থাকেন। মা যখন একদিন শ্রীশ্রী ঠাকুরের খাবার থালা নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এক মহিলা মায়ের কাছ থেকে ঐ অন্ন ব্যঞ্জনের থালা শ্রীশ্রী ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কারণ তা অতি দুর্লভ সৌভাগ্য। শ্রীশ্রী ঠাকুর যার তার স্পষ্ট খাদ্যগ্রহণ করতেন না। ঐ মহিলা থালা নিয়ে আসায় তিনি অসন্তুষ্ট হন এবং শ্রীমাকে বলেন, ভবিষ্যতে যেন এরীপ না হয়। শ্রীমা উত্তর দিলেন তা তিনি বলতে পারবেন না। মা বলে কেউ যদি তাঁকে ডাকে তাহলে তিনি ফেরাতে পারবে না। মা বলে কেউ যদি তাঁকে ডাকে তাহলে তিনি ফেরাতে পারবেন না। তিনি আরও বলেছিলেন, শ্রীশ্রী ঠাকুরতো সকলের ঠাকুর[৮]।

বাগদী যুবক শ্রীভূষণ চন্দ্র পুইল্যা তাঁর দুজন আত্মীয়সহ একদিন জয়রামবাটী যান এবং মায়ের নিকট দীক্ষার জন্য অনুনয় করেন। ঐ যুবক বাগবাজারের মায়ের বাড়িতে এলে হয়ত মা এককথায় সম্মত হতেন। কিন্তু জয়রামবাটিতে তৎকালীন লোকাচার ও দেশাচার তাঁকে মানতে হতো। হয়তো মামাদের সামাজিক দিকের কথা ভেবেও মা প্রথমে সম্মত হননি। আবেগ ভরে যুবকটি বলেন, "তোমার তো একজন বাগদীবাবা ছিল, বাগদী ছেলে কেন হবে না?" মা তাঁকে প্রসাদ খেতে বলায় উত্তর দিলেন – "যদি আমাদের মন্ত্র না দাও, আমরা খাব না"[৯]। রাত্রে সন্তানরাও উপবাদী, মাও উপবাসী থাকলেন। পরদিন সকালে মা খবর দিলেন ছেলেদের স্নান করে আসতে বল, তাঁদের মন্ত্র দেব। এ যদি সামাজিক বিপ্লব না হয় তাহলে কী? শ্রীশ্রীমা একধারে বিশ্বমাতা ও সরলা বালিকা। সরলা না হলে সমদর্শন সম্ভবই নয়। একবার একদল সাপুড়ে জয়রামবাটির পথ দিয়ে যাচ্ছিল, মায়ের খুব ইচ্ছা হল ঐ সাপ খেলা দেখার। তাদের নিজেই ডকে খেলা দেখতে চাইলেন। ডুগডুগির শব্দে গ্রামের অন্যান্য লোকেরাও এল – খেলা দেখল। মা তাদের দুটি টাকা, একটা কাপড় আর মুড়ি গুড় খেতে দিলেন। মাতৃস্নেহ পেয়ে সাপুড়েরা আনন্দিত। বিদায়ের সময়ে ওদের দলপতি মায়ের পা স্পর্শ করে প্রণাম করল, মাও মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। মায়ের এক ভ্রাতৃবধূ এ দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন সাপুড়েকে কাপড় দেওয়া হয়েছে, টাকা দেওয়া হয়েছে, আবার ছোঁয়া কেন? মায়ের মাতৃত্ব বলে ওঠে "কি করি বলো? লোকটা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে, আমি কি করে বারণ

করি? প্রণামই যদি করলে আর আমি মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করবোনি? এ তোমাদের কেমন তরো কথা!" [১০]

সে সময়ে, থিয়েটার যাত্রায় যে সব মহিলারা অভিনয় করতেন সমাজে তাঁদের কোন স্থান ছিল না। কোন কোন সমাজে থিয়েটার যাত্রা দেখাও নিষেধ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম তাঁদের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, শ্রীমাও ব্যতিক্রম ছিলেন না। থিয়েটার তিনি কয়েকবার দেখেছেন, অভিনেত্রীদের আদর ও করেছেন। কলকাতার তাঁর বাড়িতে অভিনেত্রী তারাসুন্দরী ও তিনকড়ি আসতেন। মাকে তারা গান শুনিয়েছেন। মায়ের কাছে ঠাকুরের প্রসাদ পেয়েছেন। এটি আজকের যুগের নয় সে যুগের পরিপেক্ষিতে বিচার করতে হবে যখন এক যুবক এক বিশিষ্ট অধ্যাপককে জিজ্ঞিসা করেছিলেন "ষ্টার থিয়েটার কোন দিকে" অধ্যাপক প্রথমে বলেছিলেন 'জানিনা' পরে সত্য রক্ষার্থে বলেছিলেন "জানি কিন্তু বলব না"[১১]। অধ্যাপকের সত্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এটিও প্রতীয়মান হয় যে, নাটক অভিনয় সে যুগে সন্মানের ছিল না। মা কিন্তু ধুলো মাখা ছেলেকে ধুলো ঝেড়েই কোলে তুলে নিয়েছিলেন। তার দৃষ্টিতে সবাই সমান ছিল। জয়রামবাটিতে একটি বালবিধবা যুবতী ভাগ্যদোষে বিপথ গামিনী হয়ে বিপদে পতিত হয়। সমাজপতিরা যাঁরা কোন দিন মেয়েটির খোঁজ রাখেন নি, তাঁকে কোন সাহায্য করেন নি, আজ তার পদস্খলনে তাঁকে শাস্তি দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মা চিন্তিত হলে এবং তাঁকে রক্ষা করতে প্রয়াসী হলেন। তাঁর এক সন্তান যিনি ঐ অঞ্চলের জমিদার তাঁকে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে বললেন। এবং মেয়েটি বিপদমুক্ত হয়েছে শুনে আশ্বস্ত হলে [১২]। এই প্রকার অসহায় রমণীর সাহায্যের জন্য তিনি কতদূর যেতে পারতেন তার আরও উদাহরণ আছে।মায়ের বেদান্ত চর্চা জীবনের ঘটনাগুলি থেকেই বোঝা যায়। মায়ের বাড়ি বাগবাজারে একজন মহিলার ঘনঘন আগমনে অন্যান্য স্ত্রী ও পুরুষ ভক্তরা বিরক্ত হতেন। কারণ ঐ মহিলার দুর্নাম ছিল। এমন কি শ্রীশ্রী ঠাকুরের ভক্ত বলরাম বসুর স্ত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দেবী এবিষয়ে মায়ের কাছে অভিযোগ করেন। মা উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি কি কেবল ভালটির মা – খারাপের নই?[১৩] "নায়ের এই ভালবাসা মা বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব সন্তানদের জন্য দিয়ে গেছেন "যারা এসেছে, যারা আসেনি আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা, - আমার ভালবাসা আমার আশীর্বাদ সকলের উপর আছে"[১৪]।

ব্যবহারিক জীবনে বেদান্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশিত। শ্রীশ্রী ঠাকুর দিয়েছিলেন সূত্র। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ভাষ্যকার এবং সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে এর রূপকার। আর শ্রীশ্রীমা জীবনে বেদান্তচর্চার পরীক্ষাগার। সংসারী ছিলেন না তিনি। নিজের সংসার বলতে যা বোঝায় তা তাঁর ছিল না। কিন্তু সংসারীদের থেকে বেশি সংসারে জড়িয়ে পঙ্কে পঙ্কজ হয়ে জীবনে বেদান্ত পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন, ত্যাগ, তিতিক্ষা, ক্ষমা, ধৈর্য্য তেজ এর অপূর্ব দৃষ্টান্ত শ্রীশ্রী মা।মায়ের বেদান্ত চর্চা আরও এজন্যই বলা যে সাধারণ মানুষের, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, দয়া-গুণীর প্রতি উৎসাহিত হয়। মা যদি শুধু ত্যাগী সন্তানদের মা হতেন, যদি শুধু পবিত্র আধার গৃহীর মা হতেন, তাহলে সবার মা বলা চলত না। মা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শুচি, অশুচি, পবিত্র, অপবিত্র নির্বিশেষে সকলকে বুকে তুলে নিয়েছেন। আশ্রয় দিয়েছেন, আশ্বাস দিয়েছেন। এই ভাব মার ছিল তাই তিনিই বলতে পারেন, "আমি মা, জগতের মা, সকলের মা"।

তথ্যসূত্র:

১. পূর্ণাত্মনন্দ, স্বামী (সম্পাদক), শ্রী শ্রী মায়ের পদপ্রান্তে, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১ম খন্ড, পৃঃ ৬৯।
২. পূর্ণাত্মনন্দ, স্বামী (সম্পাদক), শ্রী শ্রী মায়ের পদপ্রান্তে, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ২য় খন্ড, পৃঃ ২৬৫।
৩. পূর্ণাত্মনন্দ, স্বামী(সম্পাদক), শ্রী শ্রী মায়ের পদপ্রান্তে, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ৬৫৭।
৪. পূর্ণাত্মনন্দ, স্বামী(সম্পাদক), শ্রী শ্রী মায়ের পদপ্রান্তে, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ৬৫৯।
৫. অপূর্বানন্দ,স্বামী, জননী শ্রীসারদা দেবী, অদ্বৈত আশ্রম, কলকাতা, পৃঃ ৬৪- ৬৬।
৬. লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী (সম্পাদক),শতরূপে সারদা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অফ কালচার, কলকাতা, পৃঃ ৫৬৯।
৭. গম্ভীরানন্দ, স্বামী, শ্রীমা সারদা দেবী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,পৃঃ ১২-১৪।
৮. বসু, শঙ্করী প্রসাদ, নিবেদিতা লোকমাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃঃ ৫৪-৫৬।
৯. পূর্ণাত্মনন্দ, স্বামী (সম্পাদক), শ্রীশ্রী মায়ের পদপ্রান্তে, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ৭২৮।
১০.লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী (সম্পাদক), শতরূপে সারদা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অফ কালচার, কলকাতা, পৃঃ ৫৭১ ।
১১. দেবী, শ্রী দুর্গাপুরী, সারদা-রামকৃষ্ণ, সারদেশ্বরী আশ্রম, কলকাতা, পৃঃ ৪২৪, ।
১২. পূর্ণাত্মনন্দ, স্বামী (সম্পাদক), শ্রীশ্রী মায়ের পদপ্রান্তে, উদ্বোধন কার্যালয়,কলকাতা তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ৭৩১-৭৩২।
১৩.লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী (সম্পাদক), শতরূপে সারদা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অফ কালচার, কলকাতা, পৃঃ ২৯৯।
১৪.বসু, শঙ্করী প্রসাদ, নিবেদিতা লোকমাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা,, পৃঃ ৪২-৪৪.